গল্প

অলীক মানুষ

মৈত্রেয়ী কুমার

Read this story on my blog: http://wp.me/p7iuFD-5E

ককপিট থেকে পাইলটের যন্ত্রছেঁচা স্বর যখন ভেসে এল এয়ারক্রাফ্টের ভেতরে: ‘লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন! আমরা এখন নর্থ সী-এর উপর দিয়ে যাচ্ছি। বাইরের তাপমাত্রা মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। আকাশ অংশতঃ পরিষ্কার, আশা করছি আপনারা যাত্রা উপভোগ করছেন…,’ ঈশানী তখন মুখ বাড়িয়ে দিল ডিম্বাকৃতি বদ্ধ জালনার কাঁচের ওপরে। অনেক নীচে নর্থ সী-এর সবজেটে জলের কোল ঘেঁষে ইংলাণ্ডের তটরেখা বিছনো। চৌকো চৌকো চাষের জমি, কোনোটা ফসলা, কোনোটা বাঁজা। লাল টালির ঘরবাড়ি, থোপা থোপা সবুজ মাথার জঙ্গল, ঘুমন্ত সাপের মতো মসৃণ স্থবির হাইওয়েতে যানবাহনের জঙ্গম।

‘অত ঘাড় ঘুরিয়ে থেকো না। এই বয়েসে ঘাড়ে মোচ্ ফোচ্ লাগলে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!’ পাশে বসে সুজিত খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই মন্তব্য করল। পাত্তা দিল না ঈশানী। খুব মন দিয়ে নর্থ সী-এর ঘোলা জলে অজস্র চিন্তারাশি পাক খাওয়াতে লাগল। চিন্তাগুলো ঠিক যেন ওই সাগরের বুকে হারাধনের দশটি ছেলের একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া টুকরো টুকরো দ্বীপের মতো।

মিলিয়ে যাচ্ছে ইংলাণ্ডের ভূমিরেখা। তার অষ্টাদশী মেয়ের পূর্ণ অস্তিত্বটুকু রয়ে গেলো ওইখানে। ওর নিশ্বাস প্রশ্বাস, হাসি কান্নার আলো ছায়া, রোজনামচার ব্যস্ততা, হঠাৎ পাওয়া আলসেমির মুচমুচে আরাম, কাল বৈশাখীর ওলট পালট উদ্বেগ সবই এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে ঐ দেশের অণুপরমাণুতে। ভাবতে ভাবতেই প্লেনটা নিল জব্বর এক বাঁক। নীচের সাগর যেন টপ্ করে গিলে নিল তটরেখা আর সমস্ত আকাশটা নিমেষে যেন চলে এল ঈশানীর মুখের কাছে। সব দৃশ্য এক পলকেই অদৃশ্য! হতভম্ব হয়ে সীটবেল্টের ঘেরাটোপে তুম্বো মুখে বসে রইল ঈশানী।

সুজিত এবার নড়ে চড়ে বসে স্ত্রীর হাতে চাপ দিয়ে বলল, ‘ওভাবে কি পাখিকে ছেড়ে আসার দূরত্বের মাপজোপ হয়? বার্মিংহাম থেকে মুম্বাই এগারো ঘণ্টা। অত সমুদ্র কি দেখছ? ভবিষ্যতে তুমি তো আর সেইল করে মেয়ের কাছে যাবে না?’

স্বামীর কটাক্ষে এবারেও কর্ণপাত করল না ঈশানী। একটি বাক্য খরচ করাতেও কি ভীষণ আলসেমি। বরং মাথাটা এলিয়ে দিল হেডরেস্টে। চা-কফির ট্রলি নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়ালেন বিমান সেবিকা। একটা কফি নিয়ে ধীরে চুমুক দিল ঈশানী। আঃ, একটু যেন আরাম বোধের পালক লাগল স্নায়ুগুলোতে।

মেয়ে তার কলেজ হোস্টেলের দরজার ফ্রেমে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল বিদায় বেলায়। সেদিন সন্ধ্যে থেকেই সে কি তোড়জোড়ের পালা। কলেজের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত আন্তর্জাতীয় ছেলেমেয়েরা এসে পৌঁছেছে ক্যাম্পাসে। প্রচুর ছেলেমেয়ে আর তাদের বাবা-মায়েদের ভিড়ে ভরা ছিল ক্যাম্পাস। সবাই যে যার সন্তানকে তাদের নতুন জীবনের অঙ্গনে যতটা পারেন গুছিয়ে দিতে এসেছেন। আবার যাঁরা আসতে পারেননি তাদের ছেলেমেয়েরা বিশাল ক্যাম্পাসে ম্যাপ হাতে নিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতন ঘুরে ফিরে নিজেরাই সবকিছু সামলাচ্ছে।

মেয়ে তো প্রথম দিন থেকেই ক্যাম্পাস হোস্টেলে। ঈশানী আর সুজিত হোটেলে জলখাবার সেরে খুব সকালে চলে যেত ক্যাম্পাসে। কাজ তো কিছু কম নয়। নাম রেজিস্ট্রেশান করানো, হেলথ্ ইন্সিওরান্স কার্ড, এটিএম কার্ড, স্থানীয় ব্যাঙ্কে আকাউণ্ট খোলা, ক্যাম্পাস টুর আটেণ্ড করা। এছাড়া আছে নতুন স্টুডেণ্টদের জন্য স্বাগত পার্টি, ওরিয়েণ্টেশান ডে, অজস্র ইভেণ্টফুল ইভনিং। মেয়েকে সারাদিন কাছে পাওয়াই দুষ্কর। সে আর সুজিত ঘুরে ঘুরে মেয়ের রুমের উপযুক্ত হালকা কিছু আসবাবপত্র কিনল। দরকারি রান্নার বাসনপত্র, কাটলারি, বিছানাপত্র, টয়লেটরিজ, ফলমূল, কিছু ইজি-টু-কুক সব্জীর প্যাকেট — টুকিটাকি কেনাকাটা সারল। এরই মধ্যে যখনই মেয়ে একটু খালি সময় পাচ্ছে, তাকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ড্রিরুমে দৌড়ও। পরপর রাখা দানবাকৃতি মেশিনের কারিকুরি বোঝো, বোঝাও। রিসাইক্লিং-এর ডাস্টবিন বক্সের খোঁজ করো। কোথায় প্লাস্টিক ফেলবে, কোথায় কাগজ, কোথায় টিন, কোথায় বা ফল পাকুড় সবজির খোসা! দুদণ্ড যে মেয়েটার কাছে একটু বসবে, দুটো কথা বলবে, কিছুই হতে পারল না। শুধু নির্দেশনামার বুলি আওড়াতে আওড়াতেই পাঁচ দিন শেষ।

আর পাঁচ দিন! কোথা থেকে পেরিয়ে গেল এতগুলো বছর তারই হিসেব রইল না! মেয়ের শান্ত ভঙ্গীতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা নরম চেহারাটা মনের আয়নায় অপাঙ্গে দেখল ঈশানী। ভেসে উঠল বিদায় বেলার জলছবিটা। ঝকঝকে চোখদুটো চিক্‌চিক্ করছিল কি ওর? যদিও মুখে ছিল এক ফোঁটা হাসি। নিজেকে শক্ত নিগড়ে বেঁধে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল ঈশানী। কপালে চুমু খেয়ে মাথার চুলে যত্নে হাত বুলিয়ে

বলেছিল, ‘আমি এখান থেকে তোমার চোখের জল দেখে যেতে চাই না। হাসিমুখ দেখে যেতে চাই।’ সেই কথা শুনে মেয়ের মুখের ফোঁটা হাসি আরো যেন খানিক চওড়া হয়েছিল। চিরকালের লড়াকু। ভেতরের উদ্বেগ-টেনশান, ভয়-দুশ্চিন্তা প্রকাশ হতে দেবে না।

কোনো কথা খরচ না করে মেয়েকে নিজের বক্ষস্থলে চেপে ক্ষণকাল চুপ করে দাঁড়িয়েছিল সুজিত। মেয়ে তার মাথা রেখেছে বাবার কাঁধে। আহা থাক। আরোও একটু থাক এই ক্ষণ। নিজের চিন্তায় মগ্ন ঈশানীর সম্বিত ফিরেছিল সুজিতের মৃদু টানে। — ‘চল, ফ্লাইটের সময় হয়ে আসছে।’ লম্বা বারান্দার দুধারের সারি সারি বন্ধ দরজার মাঝে একটি দরজার চৌকাঠে নিষ্কম্প জ্যোতিতে আলো হয়ে ফুটে থাকল তাদের সন্তান। তারপর দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল সেই আলো।

ঈশানী যে জানত না যে এমন দিন আসছে, তা নয়। মেয়ের এই যাওয়া তার জীবনের যেন এক মিঠে কড়া অভিজ্ঞতা। সগৌরবে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে মেয়ে বিদেশে যাচ্ছে তাতে কোন বাপ-মায়ের না বুক ভরে যায়? কত কি ভাবনার অস্ত্রে নিজের মস্তিষ্ককে শান দিয়ে রেখেছিল ঈশানী। আর পাঁচটা মায়েদের মতো এম্পটি নেস্ট সিন্ড্রোমে ভুগবে না। বহুকিছু করার আছে জীবনে। সেই কোন ফেলে আসা দিনে কোলকাতার আর পাঁচটা মেয়েদের মতন সেও ছবি আঁকতো, গান করতো, নাচ-আবৃত্তি শিখতো। আবার কি সেই বিদ্যেগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে শুরু করা যায় না? তাছাড়া নিজের দিকেও তো একটু নজর দিতে হয়। মধ্যপ্রদেশে হালকা মেদ জমেছে। ভোরের হাঁটাটা এবার নিয়মিত করা দরকার। কোনদিন বা ক্যামেরা ঝুলিয়ে না হয় চলে যাওয়া যেতে পারে মেরীন ড্রাইভের দিকে। ঘন নীল আরব সাগরের জলে পানকৌড়ির মতো ভাসছে সেইলবোটগুলো। গম্ভীর অম্বরের বুক চিরে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলে
যাচ্ছে স্পীড বোট। সাদা-লাল রং করা মাছ ধরার ট্রলিগুলো এই ভোরে চলে যায় কত দূরে। ফেরে সাঁঝবেলায় বা রাত কাবার করে পরদিন ভোরে। পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা কালো সিল্যুটের মতন। তাতে পড়েছে নতুন ভোরের কাঁচাসোনা রং। ডানায় ভোরের আলো মেখে উড়ে উড়ে ঘুরছে সী-গল, পায়রার দল।

এতদিন ফুরসত কি ছিল এসব প্রাণভরে দেখার? উপভোগ করার? পড়া আর পরীক্ষা, একটার পর একটা। যা গেল এই বছর দুই!

চাবি খুলে ঘরে পা রাখতেই পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের দেওয়াল ভেদ করে যেন ছুটে ঝেঁপে এল পাখি আর ওর ‘মা’ ডাক। কখনো তার ব্যস্ততা, কখনো রাগ-অভিমান, কখনো খিলখিল হাসি, খুনসুটি, মা-মেয়ের তর্ক, কথা কাটাকাটি, খোস গল্প, হাসাহাসি — সব যেন কি এক দুরন্ত আলোর বন্যায় ভেসে এসে ডুবিয়ে নিয়ে যেতে থাকল ঈশানীকে। মাথাটা কি একটু টলে উঠল? সুজিত ব্যাপার বুঝে স্ত্রীকে ধরে সোফায় বসায়। জল এনে দেয় খেতে। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে, ‘কি গো, ঠিক আছো?’ অসহ্য চাপা আবেগ ভেঙে খানখান হয়ে যায় ঈশানীর। সে ডুকরে কাঁদে। ফুলে ফুলে, ফুঁপিয়ে কাঁদে পাখি-পাখি বলে।

ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমে রাত কাটলে সাত সকালে টলতে টলতে উঠে নাইটির উপর একটা হাউজ কোট চাপিয়ে নিজের জন্য এক কাপ কফি বানিয়ে নিঝুম হয়ে বসে থাকে ঈশানী।

সুজিতের জলখাবার টেবিলে দিয়ে দিলেই কাজ যেন জবাব দিয়ে চলে যাবে। দিনটাকে টেনে নিয়ে যাবার কোনো শক্তি নেই। অর্থও নেই। যে ব্যতিব্যস্ততা কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত তার বিরক্তি বা কখনো সখনো রাগের কারণ ছিল, সেই ব্যস্ততাকেই যেন ঈশানী শত শত হাত বাড়িয়ে আকুল হয়ে ডাকতে লাগল। চেতনার সমস্ত সত্তা জুড়ে পড়ে আছে শুধু অনন্ত এক স্মৃতি পথ। পায়ে পায়ে ঈশানী শুরু করে ঐ পথ ধরে হাঁটার এক মানসবিলাস।

আড়াই বছরের ছোট্ট পাখির প্রথম স্কুলের দিন। মেয়ের চেয়ে মায়েরই দুশ্চিন্তা ছিল বেশী। স্কুল ছুটি হওয়ার আধঘণ্টা আগেই ঈশানী হাজির কিণ্ডারগার্টেনের গেটে। মেয়ে বেরিয়ে এল গম্ভীর মুখে। দু চোখে এক ফোঁটা করে জল। ব্যস্ত ঈশানীর হাজার প্রশ্নবাণ ছুটে এল। মেয়ে চুপ। শেষে ঈশানী যখন হতাশ হয়ে চুপ করল, মেয়ে জানাল — তার পছন্দের নীল চেয়ারটায় তাকে বসতে দেওয়া হয়নি, একটা বিচ্ছিরি বাদামী রঙের চেয়ারে তাকে বসতে হয়েছে বলে তার একটুও ভালো লাগেনি এই স্কুল।

ছোট্ট পাখি লাল ফ্রিল ফ্রকে সেজে, সাদা তুলতুলে লাল আলো জ্বলা জুতো পরে হেলেদুলে চলেছে নিত্য নৈমিত্তিক পার্ক ভ্রমণে। পাড়ার কাজের মেয়ে বৌগুলো ক্ষনিক দাঁড়াত, পাখির মুখের পাকা পাকা কথা শুনবে বলে রাগাত। তারপর এল কত সকাল। কত রকমের সুলুক সন্ধান নিয়ে বানানো লাঞ্চ বক্স, স্কুল বাসে মেয়েকে ওঠানো-নামানো, হোমওয়ার্কের তদারকি, কত আদেশ উপদেশ অনুশাসন। আজ পাখির কত্থক ক্লাস, কি-বোর্ডের টিচার আসবে কাল। পরশু থেকে দুর্গোপূজোর রিহার্সাল; মেয়ে চণ্ডালিকায় ফসল কাটার গানে নাচবে। মেয়ের শাড়ি-গয়না-কস্টিউম, কখনো চওড়া গোঁফ চড়ছে

মুখে তো কখনো লাবণ্যময়ী নর্তকীর সাজ। কখনো বাড়ি গমগমে স্পঞ্জ বব, টম-অ্যাণ্ড-জেরী, পপ-আই দ্য সেইলারম্যানে তো কখনো ভিডিও গেমের দুরন্তপনায়। কখনো ঘরের চার কোনায় কি-বোর্ডের সুরে সুরে মূর্চ্ছনা জন লেননের সেই বিখ্যাত গান — Imagine there's no heaven/ It's easy if you try/ No hell below us/ Above us only sky/ Imagine all the people/ Living for today... Aha-ah...'

দু চোখ বুজে প্রাণভরে সুরগুলো যেন সত্তার গভীরে শুষে নিত ঈশানী। বয়েসের সাথে সাথে বাড়ল ব্যস্ততা মেয়ের। গান বাজনা তখন লুপ্ত সরস্বতী। রিসার্চ, অ্যাসাইনমেণ্ট, ডেডলাইন, রাতদিন লাপটপের টরেটক্কা, জলখাবারে কোনোমতে আধখানা পিনাট-বাটার টোস্ট, আধ গ্লাস জুস খেতে খেতে — মোবাইল, মানি পার্স, বাড়ির চাবি ব্যালান্স করতে করতে এক পায়ে মোজা, আর একটা মোজা হাতে। পেছনে ঈশানী গজগজ করছে, 'রোজ লেট নাইট করবি, সকালে উঠতে দেরী হবে আর এইভাবে দৌড়বি?'

'বাই, মা,' বলে আলগা চুমু খেয়ে এক পলকেই লিফটের গহ্বরে মেয়ে ভ্যানিশ। বকুনিটা দেবে কাকে? সব রাগ গিয়ে পড়ত শান্ত হয়ে টেবিলে বসে ধীরেসুস্থে জলখাবার খেতে থাকা সুজিতের উপর। আবার কত সন্ধ্যে পেরিয়ে কত রাত গড়াত সারাদিনের ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়া মেয়েকে তরতাজা করার ফিকিরে — কখনো হট চকোলেট, কখনো মশলা চা, কখনো মাঝরাতের স্ন্যাক্স — কত কি। ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো পটপট করে পালটে গেল শুধু!

মোবাইলের রিং টোনে সচকিত হয় ঈশানী। সদ্য বাইরে গেছে মেয়েটা। অবশ্য মুম্বাই থেকে ইংলাণ্ডের সময় হিসেবে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা এগিয়ে আছে ঈশানীরা। সেই হিসেবে মেয়ের ওখানে এখন ভোর।

ফোনের স্ক্রিনে মেয়ের মেসেজের সঙ্কেত ফুটল। ওমা, এতো ভোরে মেয়ে? মেয়েকে টেক্সট করে ঈশানী।
'জেট ল্যাগের জন্য জেগে আছিস নাকি?'
'কাইণ্ড অফ।'
'আজকে লেকচার কটায়?'
'নাইন।'
'খাবি কি জলখাবারে?'
'দেখি। বাই দ্য ওয়ে, অনেকটা বেবি স্পিনাচ্ বেঁচে গেছে। কি করব বুঝতে পারছি না।'
চটজলদি ভাবতে থাকে ঈশানী এপারে বসে। আবার প্রশ্ন ফোটে — 'ফেলে দিতে চাই না, এত দাম দিয়ে পাউণ্ডে কেনা স্পিনাচ!' সাথে ফিচেল হাসির স্টিকার। ততক্ষণে মাথায় রেসিপি এসে গেছে। পোড় খাওয়া গৃহিনীপনার দক্ষতায় ঈশানী মেয়েকে পালং শাক, পেঁয়াজ-টমেটোকুচি দিয়ে ওমলেট বানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। 'থ্যাঙ্ক ইউ' জানায় মেয়ে।

দ্রুত হাতে মেয়েকে মেসেজ করে ঈশানী। 'তোকে যে রেসিপিগুলো নোটবুকে লিখে দিয়েছিলাম, উইকেণ্ডে দেখে নিস। অনেক আইডিয়া হবে।'

ফাইনাল পরীক্ষার পর কতবার বলেছে, রান্নাঘরে আয়। এটা ওটা শিখে নে, দেখে নে। বারো বছরের স্কুল পড়াশোনার কারাবরণের মুক্তির উল্লাসে মেয়ে তখন আনন্দে মাতোয়ারা। মুখে আত্মবিশ্বাসের পপকর্ন ফুটছে — 'ও তুমি কিছু ভেবো না মা, ইউটিউবে সব দেখে নেবো।' নে, এখন কোন টিউব কি দেখাবে তোকে? হাতে কলমে না দেখলে, না শিখলে কিছু হয়? জলখাবার বানানোর ভয়ে ভোর চারটে থেকে তুই জাগা!

মেয়ের অবিমৃশ্যকারীতায় বিরক্ত হলেও অবাধ্য জলস্রোতের মতন মমতার রাশি আছড়ে পড়ে ঈশানীর বুকে। আহা, রান্নাঘর যে কি ঘেটো তার তল পাওয়া কি অত সহজ? ব্যস্ত হয়ে মেয়েকে আবার লেখে — 'আলু নরম হয়ে এলে, টমেটো তলতল করলে জানবি রেঁধে ফেলতে হবে। একবেলাও ফেলে রাখা যাবে না। তাই বেশি বেশি সবজি কিনবি না। গোল প্লাস্টিক বক্সে ফোড়ণগুলো আছে। পাঁউরুটি একগাদা দেখে এসেছিলাম। সব কিভাবে শেষ হবে? এক্সপায়রি ডেট পেরিয়ে যাবে না তো? ছটা ডিমের প্যাক বড্ড বেশী তোর জন্য। চারটে ডিমওয়ালা কিনবি। শুরুতে ক'দিন বাইরে খা না! ধীরে সুস্থে উইকেণ্ডে রাঁধবি'খন।'

উদ্বিগ্ন হয়ে বসে ভাবছে আর কি পরামর্শ দেওয়া যায়, দেখে মেয়ে লিখেছে — 'মা, ঘুমোতে দেবে?'

মনের মৌসুমী বায়ুর চাপ কাটাতে কোলকাতায় একা থাকা মাকে ফোনে ধরে ঈশানী। সময়ের হিসেব করে আজকাল ফোন করতে হয় মাকে। কখন যে মা মিত্তির বাড়ির ছোট বৌ-এর সমস্যা কি দেবী চৌধুরাণীর দাপট কি বিগ বস্-এর 'মার ডালা' জাতীয় ব্যক্তিত্বের মৌতাতে মৌজ হয়ে থাকে বোঝা মুশকিল। তবু নাতনীর কথা সাতকাহনে শোনে মা। শান্ত সুরে বলে, 'ওকে দিন পনেরো সময় দে। দেখবি অনেক থিতু হয়ে আসবে। তুই ব্যস্ত হবি না কিছুতেই।'

সেদিন পূর্বপরিকল্পনামত প্রায় ভোর রাতে স্কাইপ খুলে দেখে মেয়ের ঝুরো চুল, শুকনো মুখ। কোনো কথা না বলে মাথা নীচু করে বসে থাকে পাখি। সুজিত আর ঈশানী প্রমাদ গোনে। স্বামী-স্ত্রী কিছুক্ষণ মুখ তাকাতাকি করে। নরম সুরে মেয়েকে শুধোয় ঈশানী, 'কি হয়েছে রে?'

মেয়ে মাথা নাড়ে। ‘কিছু না।’
মাখন-গলা সুরে মেয়েকে শুধোয়, ‘খেয়েছিস?’
মাথা নীচু করেই জবাব দেয়, ‘খিদে নেই।’
‘কি!’ এবার সুজিত উত্তেজিত। ‘তোদের ওখানে এখন প্রায় রাত দশটা আর তুই এখনো ডিনার করিসনি?’

এবার মুখ তুলে ঈশানীর দিকে তাকায় পাখি। কি আছে ঐ দৃষ্টিতে? কেন বুকে একশটা মোচড় পড়ে ঈশানীর? মেয়েকে কি সে কারাবাসে দিয়ে এসেছে না সাগর জলে ফেলে এসেছে দেবতার গ্রাসের কোপে পড়ে? গলার নলীতে আটকে থাকা কান্নার দলাটাকে প্রাণপন পিছনে ঠেলতে থাকে ঈশানী। হাল ধরে সুজিত। নতুন জীবনের হাজার কর্মব্যস্ততার স্ট্রেসে সদ্য বাইরে একা থাকা মেয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। সুজিত মেয়েকে রাস্তা দেখায়। এক সময় শান্ত হয়ে আসে মেয়ে। এই সুযোগে দিদার বার্তা পৌঁছে দেয় ঈশানী মেয়ের কানে। ‘নিজেকে একটু সময় দে।’

চুপ করে বসে ওরা পরস্পরকে দেখে। স্কাইপের আকাশে খুঁজে বেড়ায় একে অপরের উষ্ণ সান্নিধ্য।

ভোরের রাতে সুজিত ঘন হয় ঈশানীর পাশে। পরস্পরের চোখের জলে বালিশ সোঁদা হয়। সুজিত বিড়বিড় করে, ‘ওর কেরিয়ার গড়তে ও গেছে। ওর ভালোর জন্যই ওকে ছেড়ে এসেছি আমরা।’
ফিসফিস করে ঈশানী, ‘জানি। শুধু আমাদের জীবনে এত জড়িয়ে ছিল ও!’
এবার দৃঢ় হয় সুজিতের গলা, ‘দ্যাখো ঈশানী, আমরা সবাই জীবনে যখন যা পাই তার গুরুত্বটুকু শুধু যদি বুঝতাম! আমরা অতীত নিয়ে দুঃখ করি, ভবিষ্যতকে ভয় পাই আর বর্তমানটাকে স্রেফ ভুলে মেরে দিই!’

ঈশানীর মন স্থির হয় স্বামীর কথায়। লঘু সুরে বলে, ‘তাহলে আজ রাতে পাখির হরি-মটর?’
‘না - না।’ দরাজ হাসে সুজিত। ‘তুমি জলের বোতল আনতে গেলে যখন তখনই বলল, ব্রেড-বাটার জিন্দাবাদ!’

চুপ করে শুয়ে ভাবে ঈশানী — সত্যি তো, একে একে নিজেদের সোনালী স্বপ্নে বিভোর হয়ে তারাও তো তিন তিনটে ভাইবোন উড়ে গিয়েছিল মাকে ছেড়ে। তারপর জীবন নদীর বিভিন্ন ঘাটে কত জল খেলা, বেচা কেনা, হিসেব নিকেষ। যে মা জীবনে একসময় অপরিহার্য্য ছিল সে-ই যেন ক্রমশঃ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। নিজের সংসারের দিনযাপনের তাড়নায় মায়ের মনের খোঁজ করার অবকাশ তখন কোথায়? কোলকাতায় গেলেও ঝটিকা সফর। এরই মাঝে কখনো হয়তো মাকে বলেছে, ‘মা, আমার এই আদ্যিকালের আঁকা ভেবলুমার্কা পালকি বেহারার ছবিটা একেবারে ড্রইংরুমে এনে টাঙালে?’ কিংবা, ‘এ কি! এত পুরনো সব আমাদের চিঠি জমিয়ে রেখেছ? দ্যাখ দ্যাখ, পাখি, দিদুর প্রাগৈতিহাসিক যুগের দলিল দস্তাবেজ!’ কখনো ধমকেছে, ‘দেয়ালগুলো ফাঁকা রাখোনি কোথাও! সব জায়গায় দিদি-আমি-ভাই কিছু না কিছু দাঁত ক্যালাচ্ছি। এত জঞ্জাল করে রাখো না!’

মা কোনোদিন উত্তর দিত না। পরের কোলকাতা সফরে গিয়ে ঈশানী আবিষ্কার করত আরো নতুন কিছু মায়ের গুপ্তধন। গ্লাক্সোর টিন সামনে নিয়ে রোদ্দুরে তেল মেখে সদ্য বসতে শেখা ভাই অথবা ফোকলা হাসিতে মুখ ভরিয়ে ইজের পরে সে মহানন্দে দিদির পাশে!

যাবার সময়ে স্তূপাকার কাগজ দেখিয়ে মেয়ে বলে গেল, ‘মা, জাস্ট থ্রো দিস অল!’ সে কি পেরেছে ফেলতে? মেয়ের সেই কোন শিশুবেলার লেখা পদ্য, আঁকা, পেইন্টিং, স্কেচ; বড়বেলার কত গল্প, কবিতা, আর্টিকল, হাতে বানানো অরিগ্যামি, কার্টুন স্কেচ, ডুডুল ড্রইং, কিচ্ছু পারেনি প্রাণে ধরে ফেলতে। পরম মমতায় জঞ্জাল জমিয়ে রেখেছে।

ঈশানী ভাবে, একসময়ে জীবনের কতো হুলুস্থুলু সামলেছে তাদের মা। মেয়েদের পছন্দের শাড়ি কেচে না আসলে, কলেজ থেকে ঝুম ক্লান্তি নিয়ে ফিরলে, মনের পারদের অকারণ ওঠা নামার ধাক্কা, সব গিয়ে পড়ত মার উপর। মা যেন আছেই এসবের জন্য। আশ্চর্য্য, এ নিয়ে তখন কোনো অনুশোচনাও হয়নি।

পাখি যখন চ্যাঁচাত, ‘আমার মেরুন জিন্সটা কাচতে দিয়েছিলাম, আজও কাচোনি মা? ভেবেছিলাম আজ পরবো!’ তখন কি যে অপরাধী লাগত ঈশানীর। ইশ, দিচ্ছি দেবো করে মেশিনে দেওয়া হয়নি। সকালের দেনা বিকেলে পাওনা মেটাত ঈশানী, মেয়ের পছন্দের চাইনিজ খাবার রেধেঁ। মেয়েকে আলোভরা মুখে খাবারের গ্রাস তুলতে দেখে তার বুক ভরে যেত আনন্দে।

সম্পর্কের দেওয়ালেও ফাঁক ফোকর থাকে। তাতে বেনোজলও ঢুকে যায় মাঝে মাঝে। লাগে খটাখটি। রাগের মুহূর্তে মেয়েকে বলত ঈশানী, ‘বাপ মায়ের হোটেলে আছিস তো, একবার বাইরে যা, তখন দেখবো কোথায় থাকে বাবুয়ানি।’ বাজার সেরে ফিরে সেদিন ফোন করেছিল মেয়ে। বাজারের ব্যাগ নিতে ভুলে গেছে। পলিব্যাগে জিনিষ ভরে আনতে হাত ছিঁড়ে পড়ছিল না কি গোটা রাস্তা। শুনে মাত্র চোখ জলে ভরে এসেছিল ঈশানীর। রাগের মাথায় যতই কটু কথা মা বলুক সন্তানকে, সন্তানের সামান্য কষ্টও মায়ের বুকে যেন শেল হয়ে বাজে।

যে মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে লাঞ্চে দেখত সবজি আর চোখ কুঁচকে ঈশানীর দিকে তাকিয়ে শুধু বলত, 'সিরিয়াসলি মা?!' আজ সেই মেয়ে যখন বলে, 'রান্না করা সবজি অনেক মিস করছি মা, চিকেন খেয়ে খেয়ে বোরড,' সেই কথা শোনার পর থেকে নিজের পাতে লাউ-কুমড়ো-উচ্ছে-ভিণ্ডিও এখন বিস্বাদ লাগে ঈশানীর।

উইকেণ্ডে ডিনারের পরপরই মেয়ের সঙ্গেঁ কথা বলতে বসে ঈশানীরা। আজ দেরি হয়ে গেছে। পাখি ফোনে মেসেজ পাঠিয়েছে তাড়া দিয়ে। রান্নাঘর পরিষ্কার করতে করতে ঈশানী সুজিতকে হাঁকে স্কাইপ খোলার জন্য। বোতলে জল ভরে একেবারে নাইটিটা চাপিয়ে নেয়।

ঘরে ঢুকে দেখে বাবা মেয়েতে কথা হচ্ছে। সোহাগী হাসিতে মুখ ভরিয়ে বাবাকে কি একটা কাগজ দেখাচ্ছে মেয়ে। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায় ঈশানী। সুজিতের মুখে প্রশয়ের হাসি, 'পাখি দিদুর কথামত পনেরো দিনের একটা প্ল্যান বানিয়েছিল। রোজ ক্রস করে গেছে। আজ ওর মিশনের শেষ দিন।'
'তো, কেমন লাগছে বল পনেরো দিনের পর?' হালকা গলায় শুধোয় ঈশানী।
হাসে মেয়ে — 'মাচ্ বেটার। আজ আমি ভাত, ডাল আর চিকেন বানিয়েছি। আমার পাশের রুমের ছেলেটা বলল ওই গন্ধে না কি ওর বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল।'
'বাঃ বাঃ, গ্রেট!' সুজিতের চওড়া হাসি।
'আজ তাড়াতাড়ি চ্যাট্ শেষ করব মা। অনেকটা কাজ বাকি আছে।'
'সে কি রে! তোকে দেখব বলে সারা সপ্তাহ অপেক্ষায় থাকি,' মুখ ফসকায় ঈশানীর।
'তা বললে হবে না, আজ আমি সত্যিই রানিং আউট অফ্ টাইম।'

কেন যে ঈশানীর কানে ভেসে আসে মায়ের মিনমিনে অভিযোগ । 'আজকাল আর অত ফোন-টোন করিস না, বুবলি?' ঈশানীর পালটা জবাব, 'কি করব বল, সময় কোথায়? পাখির ফাইনাল সামনে। সুজিতের ট্যুর ছিল। আর মালতীর কথা তো বোলো না। সপ্তাহে দু দিন গাপ মারবেই কাজ থেকে। সব সামলে আমি আর পেরে উঠি না।'

'মা, ধ্যান করছ না কি?' মেয়ের ডাকে চমক কাটে। 'আর ইউ হর্ট ? সত্যিই আজ সময় নেই।'

'দূর বোকা,' সাবধানী সুরে বলে ঈশানী। 'আমি সত্যিই চাই তুই এখানকার কথা ভুলে ওখানে ভালোভাবে সেটল্ কর।' শুনে মেয়ে হাসতে লাগল। 'হ্যাঁ রে, এতেই দেখবি তোর হোম সিকনেস চলে যাবে। নিজেকে ব্যস্ত রাখ।'

মনে মনে মেয়েকে আরো কিছু বলতে থাকল ঈশানী — "তোর ব্যস্ততার ভিড়ে যত তাড়াতাড়ি আমরা চাপা পড়ি ততই মঙ্গল। তবেই তো তুই মন দিয়ে তোর নিষ্পাপ স্বার্থটুকু দেখতে পারবি! এই স্বার্থ ধ্বংসাত্মক নয়, তোর ভবিষ্যতের জন্য গঠনাত্মক।"

মেয়েকে 'বাই' বলার সাথে মনে মনে অনেক আশীর্বাদ দিল ঈশানী। মেয়েকে বলতে না পারা মনের আকুতিগুলো নিজের মনেই বিড়বিড় করতে থাকে ঈশানী। — "এমনও নয় যে আমাদের সব কলরব কোলাহল তোকে ঘিরেই ছিল, তবে সব কোলাহল আর কলরবের মধ্যমণি হয়ে ছিলি তুই। এত বছরের স্মৃতিসৌধ খুঁড়ে চলেছি। কত মণি মাণিক্য চারিদিকে হেলায় যত্নে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আমিও তো কোনটা ফেলব, কোনটা তুলে রাখব বুঝতে পারছি না।...আমাদের কথা ঠিক এখানেই অসম্পূর্ণ থাক, পাখি। আবার তুই যখন আমার ভূমিকায় 'মা' হয়ে জীবনের নাটকে অভিনয় করবি, তখন ঠিক এখান থেকেই শুরু হয়ে সম্পূর্ণ হবে আমাদের কথা। সময় হলে ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যেক প্রজন্মের হাতে তুলে দেয় এক অলীক ঝর্ণা কলম। যার প্রতি ক্ষরণে পূর্ণ হয় মানুষের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মেতর আলোকসামান্য জীবন গাথার চিরন্তন কথা। তুই সুখে থাক, আনন্দে থাক সতত। মায়েরা আর সন্তানের কাছে কি চায় বল!"

নিজের মনে বলতে থাকা কথায় শান্ত হয়ে আসে ঈশানীর মন। মেয়ের প্রতি বিশ্বাসে, মমতায়, গৌরবে ভরা মন নিয়ে ঈশানী চোখ বন্ধ করে।

(Photo: Dragon Images/ShutterStock)